দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 16 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

৫৬

বিদ্যা—পণ্য

সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসাইন

একদা এক ব্যক্তি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন– 'বিদ্যাসাগর মশাই, আপনিতো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সিনিয়র ফেলো, কিন্তু কেন এমন হয় বলুন দেখি। যে ছেলেটি সেকেন্ড ক্লাসে (নবম শ্রেণী) পড়ে সেও যা লেখে, যে এন্ট্রান্স (প্রবেশিকা, বর্তমানে মাধ্যমিক) পাস করে সেও তাই লেখে, যে এল, এ (উচ্চ মাধ্যমিক) পাস করে সেও তাই লেখে, যারা বিএ, এমএ পাস করে তারাও তাই লেখে।' প্রশ্নটির চেয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উত্তরটি ছিলো আরো মর্মাহত হবার মতো। তিনি তদানীন্তন শিক্ষা-ব্যবস্থাকে একটি বহুমুখী কলের সঙ্গে তুলনা করেন এবং উত্তরে বলেন, "আমাদের যেসব ছেলে আছে তাদের কাছ থেকে আমরা মাইনে নিই, পাখা ফি নিই, পরীক্ষার ফি নিই। সব রকমের ফি নিয়ে কলের দরজা খুলে দিই। দেখিয়ে দিই, এইখানে মাষ্টার আছে, এইখানে পন্ডিত আছে, এইখানে বই আছে, এইখানে বেঞ্চি আছে, কালি কলমও আছে। দেখিয়ে দিয়ে কলের ভেতর ফেলে দিয়ে চাবি ঘুরিয়ে দিই। কল ঘুরতে থাকে, আর তার কোনও মুখ দিয়ে সেকেন্ড ক্লাস, কোনও মুখ দিয়ে এল,এ, বি,এ, এম,এ বেরুতে থাকে। কিন্তু টেষ্ট করে দেখ, সকলেই এরকম। একপাকের তৈরি কিনা।"

প্রায় একশ' পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল শেষ হয়ে মহারানীর আমল শুরু হয়েছে। মেকলে এবং উড্ সাহেবের লেখালেখির ফলে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হয়েছে, স্কুল হয়েছে, উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজ এবং পরে ১৮৫৮-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়- এই উপমহাদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এদেশে কোন্ ধরনের শিক্ষানীতি চালু থাকবে– পাশ্চাত্যমুখী না প্রাচ্যমুখী– এ বিতর্কের মীমাংসা করতে গিয়ে মেকলে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন একটি প্রয়োজনবোধে– শাসক-শাসিতের মধ্যে এক দোভাষী শ্রেণীর সৃষ্টি করা যারা এদেশে ব্রিটিশ শাসনের অনুগত সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। এভাবে এদেশের মানুষের জন্য ইংরেজ সরকারের চাকরি করার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তাদের আমন্ত্রণ জানানো হলো, আকৃষ্ট করা হলো। বাঁধ ভেঙ্গে গেল পাশ্চাত্য শিক্ষার, উচ্চশিক্ষার জোয়ারে ভেসে গেল দেশ। একটি পরাধীন এবং শোষণ-লুন্ঠনে দরিদ্র দেশের পক্ষে এ খুবই স্বাভাবিক ছিল।

সরকারী চাকরির প্রতি এদেশের শিক্ষিত শ্রেণীর এই মোহ এবং চাকরির জন্যই শিক্ষা এই ধারণার জোয়ার দেখে উড্ সাহেব হয়তো শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। তাই তার ১৮৫৪ সালের সেই ঐতিহাসিক শিক্ষাসংক্রান্ত ডেসপ্যাচে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন– "However large the number of appointments under Government may be, the views of the natives of India should be directed to the far wider and more important sphere of usefulness and advantages which a liberal education lays open to them." সরকারী চাকরির সংখ্যা যত বেশিই থাকুক না কেন, একটা উদারনৈতিক শিক্ষার যে বৃহত্তর এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা রয়েছে সেদিকে ভারতীয়দের দৃষ্টি ফেরানো উচিত। কিন্তু কে কার কথা শোনে, সরকারী চাকরির নেশায়, আরাধনায় মত্ত মানুষ। তাদের 'ধর্মের' কাহিনী, শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ, লক্ষ্যের কথা কে শোনাবে? বিশ্ববিদ্যালয়তো সমাজের একটা ইন্সটিটিউশন। সমাজ যে ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, বিশ্ববিদ্যালয় সে ব্যাধি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পারে নি, সেদিনের শিক্ষাব্যবস্থা পারেনি, যেমন পারছে না আজকের এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাব্যবস্থা। একটা উন্নত উদারনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থার সুফল পাওয়া যাচ্ছে না দেখে বিদ্যাসাগর দুঃখ পেয়েছিলেন এবং এই দুঃখবোধ থেকেই তিনি এ ধরনের উত্তর দিয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়, তীব্র সমালোচনা শুরু হয় এবং সবকিছু পুনরায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার জন্য কমিশন গঠন করা হয়। মেকলে চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের ফলে এদেশের মানুষ রক্তমাংসের গড়নে ও দেহের রঙে ভারতীয় হবেন বটে, কিন্তু রুচি, মতামত, নীতিবোধ ও বুদ্ধির দিক দিয়ে-হবেন খাঁটি ইংরেজ। কিন্তু মেকলের আমগাছে আমের চেয়ে আমড়াই বেশি ফলেছিলো। বৃটিশ প্রচলিত শিক্ষা এদেশে কিছুসংখ্যক প্রতিভার জন্ম দিয়েছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, মুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্বানেরও জন্ম দিয়েছে; কিন্তু সৃষ্টি করেছে অগণিত সরকারী চাকুরে যাদের দু'একটি দুর্লভ ব্যতিক্রম ব্যতীত সকলেই কিন্তু 'বিদ্বজ্জন' নন। 'বিদ্বজ্জনে'র সংজ্ঞা অন্যরকম।

যে সময়ের কথা এতক্ষণ ধরে বলছি, তারপর অনেকদিন কেটে গেছে, আগেই বলেছি প্রায় ১৩৫ বছর। এ উপমহাদেশের গঙ্গা, যমুনা, পদ্মা, মেঘনা দিয়ে অনেক পানি বয়ে গেছে, অনেক রক্ত ঝরেছে, অনেক উত্থানপতন ঘটেছে। উপমহাদেশ প্রথমে দ্বিখন্ডিত, পরে ত্রিখন্ডিত হয়েছে। অতীতের ব্রিটিশ ভারত এখন তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র। অসংখ্য স্কুল, কলেজ, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির কল্যাণে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার্জনের সুযোগ-সুবিধা, উপকরণ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন নতুন তথ্য, তত্ত্ব, পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। নিজের দেশের কথাই ধরা যাক। বিশ দশক থেকে চল্লিশ দশক পর্যন্ত এদেশে ছিলো একটি বিশ্ববিদ্যালয়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। যে বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হয়েছিল ১৯২১-এ মাত্র ৮৭৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে আজ বুঝি সেখানে ছাত্রসংখ্যা ৩০ হাজারও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। চল্লিশ দশকের পর থেকে আজ পর্যন্ত আরও নয়টি বিশ্ববিদ্যালয় জন্ম নিয়েছে। সেগুলোতেও রয়েছে বেশ কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী। ইদানীং দুটো প্রাইভেট বা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ও কাজ শুরু করেছে। চাকরি ও পেশায় নিয়োজিত উচ্চশিক্ষাকাঙ্ক্ষীদের জন্য রয়েছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। প্রত্যেক জেলা শহরে রয়েছে সরকারী কলেজ এবং সরকারী মহিলা কলেজ। থানায় থানায় কলেজ, ইউনিয়নে ইউনিয়নে স্কুল। চল্লিশ দশকে আমাদের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। পঞ্চাশ, ষাট দশকে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা উপকরণের কথা শিক্ষার্থীরা ভাবতে পারতো না, আজকের শিক্ষার্থীরা তা পাচ্ছে। শুধু শিক্ষার্থী নয়, শিক্ষকরাও দেশে এবং দেশের বাইরে গিয়ে গবেষণা বা আরও উঁচু পর্যায়ের জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাচ্ছেন যা আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি প্রসারিত। এসবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে জাগে- মেকলের আমগাছে কি এখনও আমড়াই বেশি ফলছে? শিক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যাগত এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির সমান্তরালে কি গুণগত-মানগত উন্নতি ঘটেছে?

এ নিয়ে দু'ধরনের মত রয়েছে। একটি হলো– না, ঘটেনি বরং অবনতি হয়েছে। অপরটি হলো আজকের শিক্ষার্থীরা ত্রিশ বা চল্লিশ দশকের শিক্ষার্থীদের চেয়ে অনেক বেশি জানে, তাদের জ্ঞানের পরিধি অনেক বেড়েছে। আসলে, আজকের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর জ্ঞান সমৃদ্ধতর হওয়ার কথা, কারণ তাদের জ্ঞান আহরণের সুযোগ-সুবিধা আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি। তাছাড়া মানব সভ্যতার অগ্রগতিই তো হয়েছে জ্ঞানের নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কারের ফলে। আজকে শহরে-বন্দরে এমন কি গ্রামে-গঞ্জেও একজন স্কুলের ছাত্র রেডিও'র নব (knob) ঘোরালে কিংবা টেলিভিশনের সুইচ টিপলেই তার হাতের কাছে ধরা দেয় সারা পৃথিবীর খবর। অর্ধশতাব্দী আগে আমরা যখন স্কুল কলেজে পড়েছি তখন কি জানতাম, না জানতে উৎসাহী হতাম, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের জন্য কে কার প্রতিদ্বন্দ্বী, সুদূর সোমালিয়া বা আর্জেন্টিনায় কি ঘটছে? ঘরে বসে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা বা অষ্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট খেলা দেখার সুযোগ পেতাম? আজকে যে জানতে চায়, বুঝতে চায়, সারাবিশ্বই তার দোরগোড়ায়। কোন তথ্য বা পরিসংখ্যান পেতে হলে দীর্ঘ ক্লেশকর হিসেবনিকেশ বা বিশ্লেষণে যেতে হয় না, হাতের কাছে রয়েছে কম্পিউটার। কিন্তু আজকের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই জানতে-বুঝতে চায় না, বিশ্লেষণে যেতে চায় না। তার জন্য সময়ের দরকার, সাধনার দরকার; সে সময় আজকের শিক্ষার্থীর নেই, সাধনা অনর্থক কালক্ষেপণ। শুধু উদ্দাম গতিতে এগিয়ে যাওয়া, সহজ ও স্বল্পতম প্রয়াসে পরীক্ষা পাস করে একটা ডিগ্রী লাভ করা। আজকের শিক্ষা পরীক্ষাসর্বস্ব, শিক্ষার্থী ডিগ্রী মোহগ্রস্ত– একথা তো অস্বীকার করা যায় না। জ্ঞান আহরণের এতো সুযোগ-সুবিধা, উপকরণ থাকা সত্ত্বেও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি শিক্ষিতদের মধ্যে প্রকৃত চিন্তাশীল মনীষার বিকাশ যতটুকু হওয়ার কথা ছিল তা হচ্ছে না।

খবরে প্রকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন হাজার ভর্তি আসনের জন্য পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি ভর্তি আবেদনপত্র পাওয়া গেছে। অন্যান্য আরও তিনটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি-ভিড়, কম নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য এই অতিআগ্রহ, অধীরতা কেন? কেউ হয়তো বলবেন, এ তো আনন্দের কথা। শিক্ষার প্রসার ঘটছে, দেশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সত্যি কি তাই? আসলে এই অধীরতা প্রকৃত শিক্ষা লাভ করে নিজেকে একজন সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে বিকশিত করে তোলার জন্য নয়। পরীক্ষা পাস এবং ডিগ্রী লাভ এখন জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য; শিক্ষার্থী, শিক্ষক অভিভাবক সবারই উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা পরীক্ষা ও ডিগ্রীকে ঘিরে। কেন? 'কেবল চাকরির একটি ছাড়পত্র লাভের জন্য, বেঁচে থাকার একটা chance পাওয়ার জন্য।' এ যুগে এদেশে অর্থোপার্জনে তীব্র প্রতিযোগিতা; সেই প্রতিযোগিতার বাজারে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা প্রতিযোগী সবচেয়ে বেশি চটকদার এবং আকর্ষণীয়, কাটতি বেশি হবে। সরকারী কলেজ থেকে পাস করা তার চেয়ে কম, বেসরকারী কলেজ থেকে পাস করা তার চেয়ে আরও কম। ইংরেজরা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পরীক্ষা পাস' ও ডিগ্রীকে বিদ্যার মাপকাঠি বলে ঘোষণা করেছিলেন। ইংরেজ প্রভুরা চলে গেছেন, দেশ স্বাধীন হয়েছে, সমাজের মানুষের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে; কিন্তু সেই মাপকাঠি আজ দেড়শ'/দু'শ' বছর পরেও রয়ে গেছে অপরিবর্তিত। এখনও একজন চাকরিপ্রার্থী কি পাস, কোথা থেকে পাস, চাকরির বাজারে তা দিয়ে তার দর নির্ধারিত হয়। সুতরাং যোগ্যতা থাক বা না থাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে; কিংবা কোনও সরকারী কলেজে– এই-ই আজকের তরুণ শিক্ষার্থীর অনুধ্যান।

বিদ্যার যে একটা আদর্শের দিক আছে যা অপূর্ণ আংশিক মানুষকে পরিপূর্ণ অখন্ড মানুষ করে গড়ে তুলতে একান্ত অপরিহার্য তা আমরা ভুলে যেতে বসেছি। যে বিদ্যা একজন মানুষকে দেয় প্রচন্ড আত্মশক্তি, আত্মবিশ্বাস, তার মধ্যে সৃষ্টি করে সৃজনশীলতা, সে মর্যাদাবোধ, বিদ্যা চর্চার সময়, আগ্রহ, মানসিকতা আমাদের আর নেই। চরম দারিদ্র্য, বেকারত্ব, জীবিকা অর্জনের সুযোগের অপ্রতুলতা শিক্ষাকে করে তুলেছে পণ্য, বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়কে করে তুলেছে ইন্ডাষ্ট্রি। যন্ত্রের যেমন এক্সপার্ট-টেকনিশিয়ান রয়েছে, বিদ্যারও এক্সপার্ট রয়েছে, তারাও টিউটরিয়েল, কোচিং সেন্টার নাম দিয়ে কারখানা খুলে বসেছে। আমার পরিচিত এক ব্যবসায়ী আমাকে একবার একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন 'আপনিতো অনেক বছর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে কাটিয়েছেন। চলুন না একটা ইউনিভার্সিটি খুলি। খুব লাভ হবে।' আমার ভেতরের উত্তেজনা অনেক কষ্টে দমন করে তাকে উত্তর দিয়েছিলাম —'আমি বিশ্ববিদ্যালয় বুঝি, কিন্তু ব্যবসা বুঝি না। আপনি অন্য ব্যবসার কথা চিন্তা করুন।'